পাখির কাছে যাওয়া

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

প্রত্যক্ষভাবে বাঘ মানুষের তেমন কোনো উপকার করে না, পাখি যেমনটা করে। কিন্তু এমনই স্বভাব মানুষের যে বাঘকে সে বেশ সমাদর করে। সম্ভ্রমও জানায়, ভয়তো পায় অবশ্যই, হত্যা করতে হবে ভাবলে রীতিমত শিউরেই ওঠে; ওদিকে অমন যে উপকারী প্রাণী, পাখি, নিতান্তই নিরীহ তাকে দেখলে মানুষের হাত নিসপিস করে, কারণে তো অবশ্যই অনেক সময় অকারণে, নিতান্তই শখের বশে পাখিকে হত্যা করতে সে উদ্যত হয়। পার্থক্যের এই বিষয়টাতে আমরা একটু পরে আবার আসবো, আপাতত উপকারের প্রসঙ্গটার দিকে চোখ দেয়া যাক।

মানুষ নিশ্চয়ই মানুষের উপকার করে। এই যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি এগুলো কি করে? তাই বলে সব উপকার যে উপকার তা নয়, অনেক সময় অপকারের ছদ্মবেশ বটে। গেল হরতালের সময় পত্রিকায় ছবি ছাপা হয়েছে এক যুবকের; তার গলা পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে আরেক ব্যক্তি, মনে হবে বন্ধু বুঝি তারা; পরস্পরের সঙ্গে অলিঙ্গনে অবদ্ধ। কিন্তু বাহু বেষ্টনীর ভেতরকার যুবকের মুখের দিকে তাকালেই চমকে উঠতে হয়। আসলে হারানো বন্ধুকে ফিরে পেয়ে তাকে গলায় ধরে যে আদর করা হচ্ছে তা নয়, যেটা করা হচ্ছে তা হলো আটক করার চেষ্টা। যুবকটিকে নির্বিঘ্নে যাতে প্রিজন ভ্যানে তোলা যায় তার জন্যই সাদা পোশাকধারী পুলিশের ওই কায়দা। উপকারের ছদ্মবেশ।

আমরা বাঙালি উপকারে তেমন বিশ্বাস করি না। আমরা বলি উপকারীকে বাঘে খায়। উপকার সম্পর্কে এটা একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। নিষেধ করা হচ্ছে। অপরের উপকার করতে যেয়ো না। বিপদে পড়বে। আবার যখন বলা হচ্ছে যে বাঘে ছুলে আঠার ঘা, তখন ওই ভয়টা বাঘের ব্যাপারেই ব্যক্ত বটে, তবে উপকার যে বাঘের মতো হিংস্র হতে পারে সে অভিজ্ঞতাও আমাদের রয়েছে। একেবারে মর্মে মর্মে। যেমন ধরা যাক, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কান্ডটা। ওরা তো উপকারের জন্যই এসেছিল। তাই বলেছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য করবে। মাল কেনাবেচা হবে। আমাদের ঘরে দু'পয়সা উঠবে। কার্যক্ষেত্রে সেই উপকার ভয়াবহ অপকার হিসেবে দেখা দিয়েছে। যার হাত থেকে আমরা এখনও মুক্ত হতে পারিনি।

ঔপনিবেশিক শাসকেরা আমাদের মস্ত উপকার করেছিল ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করে। সেই শিক্ষার সবটা যে উপকারে লেগেছে তা মোটেই নয়। বরঞ্চ এটা দেখা গেছে যে, দেশে বড় বড় যত অনাচার ঘটেছে তার মূল হোতা অশিক্ষিত মানুষ নয় শিক্ষিত মানুষই বটে। তার জন্য শিক্ষাকে অভিশাপ দেওয়া হয়তো অন্যায়; কিন্তু শিক্ষা মানেই যে আলো ছিল তা কিছুতেই বলা যাবে না। সেকালের মানুষ ইংরেজের কাছ থেকে যত উপকার লাভ করেছে তার মধ্যে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা সর্বাগ্রগণ্য এই রকমের একটা মত চালু ছিল, এখনও যে নেই তা নয়। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষা যে আমাদের হীনম্মন্য করেছে, বিঘ্নিত করেছে মাতৃভাষার স্বাধীন ও স্বাভাবিক বিকাশকে- এই নির্মম সত্যটাকে অস্বীকার করি কিভাবে? এখন যে ইংরেজি মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করা হচ্ছে, পিতামাতা টাকা-পয়সা, আদর-যত্ন সবকিছু ওই খাতে ভীষণভাবে নিয়োগ করে চলেছেন তার দ্বারা সন্তানদের উপকার হবে বলে ভরসা আছে। কিন্তু ওই সন্তানরা যে দেশের জনজীবন, সংস্কৃতি, ইতিহাস, পরিবেশ সবকিছু থেকে সমূলে উৎপাটিত হয়ে খন্ডিত মানুষে পরিণত হচ্ছে তার খবর তো নেওয়া হচ্ছে না। দেশে মৌলবাদ প্রবল হয়ে উঠছে দেখে যারা বেশ সন্ত্রস্ত তাদের আপনজনেরাই কিন্তু মহোৎসবে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রসারের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। যারা মাদ্রাসা খোলেন, মাদ্রাসা শিক্ষায় উৎসাহ যোগান, তাদের ভাবখানা এই রকমের থাকে যে, তারা দেশের মস্ত বড় উপকার করছেন। তাদের কাজের সঙ্গে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ঘটছে। অতই যদি বোঝেন তাহলে নিজেদের সন্তানদের মাদ্রাসায় পাঠানো থেকে বিরত থাকেন কেন? মাদ্রাসায় পাঠালে গরিব মানুষের উপকার হবে বলে ধারণা করা হয়। এও ওই উপকারের অন্তরালে অপকার করার অভিসন্ধি বটে। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গরিব ছেলে-মেয়েরা যে তাদের দারিদ্র্যকে চিরস্থায়ী করবে 'উপকারীরা' এটা ভাবেন না বা ভাববার প্রয়োজন বোধ করেন না। আসলে গরিবের উপকার নয়; উপকার করতে চান নিজেদের। মাদ্রাসা খুললে পুণ্য বাড়বে এই বোধ আছে; মাদ্রাসা খুলতে খরচ অল্প এই বিবেচনাও কাজ করে। সর্বোপরি হয়েছে দানবীর হিসেবে প্রতিপত্তি লাভের আশা। এক খরচে অনেক লাভ। কিন্তু তাতে গরিব মানুষের যে ক্ষতি হচ্ছে, দেশে শিক্ষাভিমানী বেকারের সংখ্যা যে বাড়ছে এবং মৌলবাদের গোড়ায় যে পানি সিঞ্চন ঘটছে উপকারীদের হাতে, এসব নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার মতো বাড়তি সময়টা কোথায়?

একই রকমের উপকার বিশ্বব্যাংক করে চলেছে। তারা পরামর্শ দিচ্ছে লোকসানজনক বলে চিহ্নিত করে আমাদের শিল্পকারখানার অনেকগুলোকেই বন্ধ করে দিতে, যাতে আমরা শিল্পে উন্নত হবার সম্ভাবনাকে উৎপাঠিত করে পুঁজিবাদী বিশ্বের ওপর আরো গভীর ও নিবিড়ভাবে নির্ভরশীল হতে পারি। কলকারখানা ব্যক্তি মালিকানায় চলে গেলে বিশ্বব্যাংকের উপকারী কর্তারা মহাখুশি, কেননা তারা জানে ওই পদক্ষেপের প্রতিফলটা হবে এই যে, কলকারখানাগুলো চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা যাতে বিশুদ্ধ পানি সেবন করতে পারি তার জন্য ইউনিসেফ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের জন্য অসংখ্য টিউবওয়েল বসিয়ে দিয়েছে; ফল হয়েছে এই যে এখন আমরা আর্সেনিকের তাড়া খেয়ে আতঙ্কের মধ্যে বসবাস করছি। ভালো কথা, বিশ্বব্যাংক চেয়েছে আমাদের আদমজী পাটকল বন্ধ হয়ে যাক, তারা কামিয়াবী হয়েছে, আমরা কল বন্ধ করে দিয়েছি, কেবল কারখানা শ্রমিক নয়, পাটচাষী এবং পাটচাষ সবকিছুরই সর্বনাশ ঘটাতে সমর্থ হয়েছি। অথচ সীমান্তের অপর পারে নতুন নতুন পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বব্যাংকেরই অর্থ সাহায্যে। আমাদের পরম-উপকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরামর্শ দিচ্ছে তেল-গ্যাস বিদেশে বিক্রির, বিদ্যুৎ ও বন্দর ব্যবস্থাপনা বিদেশীদের হাতে তুলে দেওয়ার। সবই আমাদের উপকারের লক্ষ্যে, তাতে আমাদের যদি সর্বনাশ হয় তবে হোক না। পুরনো সত্য তো রয়েছেই যে কারো জন্য যা পৌষ মাস, কারো জন্য সেটাই সর্বনাশ। ঈশপের গল্পও তো বলে দিচ্ছে এই সত্য যে বালকদের জন্য যা খেলা, পুকুরের ব্যাঙদের জন্য সেটাই মৃত্যু।

মহাজনরা এক সময়ে ঋণ দিতো। কৃষকের যাতে উপকার হয়, বেচারা যাতে পানিতে না পড়ে সে- জন্য ঋণদাতা মহাজন বড়ই তৎপর থাকতো। বিশেষ করে আকালের সময়ে। পুরনো মহাজনরা এখন কিছুটা কোণঠাসা অবস্থায় আছে, তাদের জায়গায় নতুন মহাজনরা এসে গেছেন। তাঁরা মোটেই সুদখোর নন, এঁরা হচ্ছে পরমোপকারী বেসরকারি সাহায্য সংস্থা; গরিব মানুষকে এঁরা উদার হস্তে ঋণ দেন। অতি উচ্চ হারে সুদ নেন, ঋণখেলাপি হবার কোনো রাস্তাই খোলা রাখেন না। এভাবে তাদের কর্ম এলাকা স্ফীত হয়, তাঁরা নতুন নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে

তোলেন, আন্তর্জাতিক পুরস্কারাদি লাভ করেন, এবং এমনও তত্ত্ব প্রচার করেন যে, ঋণ পাওয়ার অধিকার মানুষের মৌলিক অধিকার, যেমন কথা পৃথিবীর অন্য কোথাও এবং অন্য কোনো যুগে শোনা যায়নি। আমাদের রাষ্ট্রও অবশ্য ভয়ঙ্করভাবে ঋণগ্রস্ত। পরোপকারী বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল প্রভৃতি মহাজনী প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজিবাদী দেশগুলো তাদের নিজেদের শর্তে আমাদেরকে ঋণ দিচ্ছে এবং আমাদের রাষ্ট্রনায়ক ও আমলারা দেশবাসীর ভবিষ্যৎকে বন্ধক রেখে সেই ঋণ সংগ্রহ করে নিজেদের জন্য যত রকম সুবিধা আদায় করা যায় তা আদায় করে নিচ্ছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেদেরকে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক বলে বিজ্ঞাপিত করছেন।

সাম্রাজ্যবাদীরা যে কেমন উপকারী মানুষ তা কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার থেকে শুরু করে আজকের আমেরিকানদের ইরাক অধিকার পর্যন্ত শত শত বছরের ইতিহাসে বিকীর্ণ রয়েছে। ইরাকবাসী তো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে আমেরিকানরা কত বড় পরোপকারী, টের পাওয়ার ব্যাপারে ফিলিস্তিনিদের তো কোনো বিরামই নেই। আমাদের দেশী শাসকরাও দেশবাসীদের সঙ্গে মানবিক ব্যবহার করে না। তাদেরকে বিবেচনা করে প্রজা হিসেবেই।

কথাটা কেবল তাই এই নয় যে, উপকারীকে বাঘে খায়, কথাটা এটাও যে উপকার অনেক সময়েই এক প্রকার ব্যাঘ্রস্বরূপ। হ্যাঁ, উপকার করতে গিয়ে অসংখ্য যথার্থ পরোপকারী প্রাণ দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু ভন্ড উপকারীদের করাল গ্রাসে মানুষের বহু অর্জন যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেটাও কম বড় সত্য নয়।

দেশে এক সময়ে রেল লাইন বসেছিল, সেও মানুষের কল্যাণের স্বার্থেই। তা কল্যাণ হয়েছে বৈকি। যোগাযোগ ব্যবস্থায় উন্নতি ঘটেছে, চলাচল অনেক সহজ হয়েছে। উদ্দেশ্যটা কিন্তু মানুষের উপকার করা ছিল না। ছিল ব্রিটিশ শাসন ও বাণিজ্যকে সাহায্য করা। সেটাই ঘটেছে প্রধানত। রেল কোম্পানিরও আয় হয়েছে প্রচুর। কিন্তু তাতে জনপদের ওপর যে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সেটাও সত্য। বাংলায় নদীগুলোর প্রবাহ হচ্ছে উত্তর থেকে দক্ষিণে, আর রেল লাইন চলে গেছে পশ্চিম থেকে পূর্ব থেকে, ফলে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বিঘ্নিত হয়েছে, বন্যা ও জলাবদ্ধতা দুটোই বেড়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে ম্যালেরিয়াও। রেল লাইন খুবই জরুরি, কিন্তু সেটা আরো অনেক উপকারে আসতো যদি জনকল্যাণ হতো প্রথম বিবেচনা।

রেল যোগাযোগ যতটা উপকার করছে সড়ক যোগাযোগ কিন্তু ততটা করতে পারছে না। বাংলাদেশে রেল ব্যবস্থার প্রসার বরঞ্চ বেশি দরকার ছিল সড়ক তৈরির তুলনায়। সড়ক হওয়ায় জমি গেছে, গাছ ধ্বংস হয়েছে, পরিবেশ দূষণ ঘটছে, এবং দুর্ঘটনার তো কোনো হিসাবই নেই। সড়কের উন্নয়ন জনগণের ভালোর জন্য ঘটানো হয়নি, ঘটানো হয়েছে ঠিকাদার, নির্মাণ ব্যবসায়ী, যানবাহন ব্যবসায়ী, রাজনীতিক, আমলা মোটর বিক্রেতা ও তেল সরবরাহকারীদের স্বার্থে। সে জন্যই এতো বিড়ম্বনা।

বিদ্যুতের যোগাযোগকে বৈপ্লবিক ঘটনা বলা হচ্ছে। তা বৈপ্লবিক বৈকি। অন্ধকার বিদীর্ণ হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ কি শিল্পকারখানায় উৎপাদন বাড়িয়েছে? শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে গ্রামে-গঞ্জে? সেখানে তো বরঞ্চ দেখা যায় বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হচ্ছে টেলিভিশনে বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান দেখতে।

আসল কথাটা হলো আমাদের প্রায় কোনো উন্নতিই উন্নতি নয়। সকল উন্নতির নিচেই বঞ্চনা আছে মানুষের। কোথাও কোথাও চাপা পড়ে রয়েছে মানুষের আর্তচিৎকার। কারণ? কারণ হলো এইসব উন্নতি সকল মানুষের স্বার্থ বিবেচনা করে পরিকল্পিত হয়নি, এদের লক্ষ্য হলো অল্প মানুষের উপকার করা, যেটা করতে গিয়ে বঞ্চিত ও পীড়িত করতে হয়েছে অধিকাংশ মানুষকে। সে- উপকার মোটেই উপকার নয় যা অল্প মানুষের গুদামে চলে যায় বেশি মানুষকে বঞ্চিত করে।

সাম্রাজ্যবাদীরা যে কেমন উপকারী মানুষ তা কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার থেকে শুরু করে আজকের আমেরিকানদের ইরাক অধিকার পর্যন্ত শত শত বছরের ইতিহাসে বিকীর্ণ রয়েছে। ইরাকবাসী তো হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে আমেরিকানরা কত বড় পরোপকারী, টের পাওয়ার ব্যাপারে ফিলিস্তিনিদের তো কোনো বিরামই নেই। আমাদের দেশী শাসকরাও দেশবাসীদের সঙ্গে মানবিক ব্যবহার করে না। তাদেরকে বিবেচনা করে প্রজা হিসেবেই।

২.

বাঘ মানুষের তেমন একটা উপকারে আসে না, তবু মানুষ বাঘকে খুবই সম্মান করে। বাঘের মতো সাহসী ও পরাক্রমশালী হতে চায়। গর্জন করতে ভালোবাসে। বড় বড় মানুষ যারা বাংলার সাধারণ লোকেরা তাদেরকে বাঘ হিসেবে কল্পনা করতে অনভ্যস্ত নয়। যেমন শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কিংবা বাঘা যতীন আমাদের কাছে সম্মানীয় ব্যক্তি যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষের মতো মানুষ বাঙালি বাঘ হিসেবে দেখতে পছন্দ করে।

তুলনায় পাখি যে কতভাবে আমাদের উপকারে আসে সেটা তো হিসাব করে শেষ করা কঠিন। পাখি আমাদেরকে গান শোনায়, পাখির সৌন্দর্য আমাদেরকে আনন্দ দেয়। অনেক পাখি ময়লা-আবর্জনা এবং অনাবশ্যক ও ক্ষতিকর পোকামাকড় ভক্ষণ করে আমাদের জন্য অবৈতনিক পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে কাজ করে। পাখি আমাদের ঘুম ভাঙায়, সময় জানায়, কাজ করে অযান্ত্রিক ঘড়ির। 'যাও পাখি বলো তারে সে যেন ভোলে না মোরে', এই বাণী পাখি বহন করেছে- কেবল কল্পনায় নয় বাস্তবেও। ডাকবাহক হিসেবে পাখি অত্যন্ত বিশ্বস্ত, দূত হিসেবে নির্ভরযোগ্য। নূহের জাহাজে মাটির খবর পাখিই এনেছে।

সেই যে নির্জন এক দ্বীপে রবিনসন ক্রুশো একাকী ২৮ বছর কাটালেন, পারলেন কাটাতে, তার পেছনে সাহায্য ছিল একটি কুকুর, কয়েকটি বিড়াল ও একটি টিয়া পাখি। অনেক পাখি ছিল ওই দ্বীপে। ভাগ্যিস ছিল, নইলে অসহায় রবিনসন তো মারা যেতেন না খেয়েই। রবিনসন সর্বক্ষণ আতঙ্কে থাকতেন বনমানুষ ও বন্য প্রাণীর। পাছে তারা আক্রমণ করে। না, পাখির কাছ থেকে কোনো বিপদ ছিল না ওই নিঃসঙ্গ দ্বীপবাসীর; বরঞ্চ পাখিরা তাকে সাহায্য করেছে, খাদ্য দিয়েছে, এবং বন্ধুত্বও দিয়েছে! এই বন্ধুত্বের ব্যাপারটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কুকুর ভীষণ প্রভুভক্ত হয়, রবিনসনের কুকুরটি যেমন ছিল। কিন্তু কুকুর তো কথা বলে না। শেখালেও শিখতে পারে না, বড় জোর লেজ নাড়ে। পাখি পারে। পাখিরা নানা স্বরে ও সুরে কথা বলে। কথা তো নয়, অধিকাংশ সময়েই মনে হয় বুঝি বা গাইছে গান। সব পাখি গানের পাখি নয়, কিন্তু সব পাখির কথাতেই গান থাকে, পরস্পরের উদ্দেশ্যে। কোনো কুকুরের কাছ থেকেই যা প্রত্যাশিত নয়। রবিনসনও তার বিপদবান্ধব কুকুরটির কাছ থেকে কোনো গান শুনতে পাননি। গান তো দূরের কথা, কথাও নয়। কিন্তু বন থেকে ধরে আনা একটি টিয়া পাখির কাছ থেকে কথা পেয়েছেন। অনেক কষ্টে টিয়া পাখিটিকে তিনি কয়েকটি কথা শিখিয়েছিলেন, যেগুলো শুনে তাঁর নিঃঙ্গতার ভার কিছুটা হলেও লাঘব হতো। পরে অবশ্য একজন মানুষকেই পেয়ে গেছিলেন তিনি, ভৃত্য ও বন্ধু হিসেবে যাকে তিনি ভাষা শিখিয়েছেন। যার ফলে সে রবিনসনের সঙ্গে ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে পারতো। কথা বলার দিক থেকে পাখি পশুর চেয়ে অগ্রসর। মানুষের নিরিখে রূপকথায় দেখি পাখিরা মানুষকে পরামর্শ দিচ্ছে; কারণটা বোধ করি অন্তর্গত নৈকট্যই।

কিন্তু এই যে উপকারী ও মানুষের নিকটবর্তী প্রাণী- আকাশ ও গাছের পাখি একে দেখলে মানুষের ভেতর আদিম বর্বরতা অনেক সময়েই উথলে ওঠে। কোলরিজের সেই অসামান্য কবিতা 'দি এনসিয়েন্ট মেরিনার'-এর নাবিকটি কথা নেই বার্তা নেই একদিন একটি অতিথি পাখিকে হত্যা করে ফেললো। প্রকৃতি অবশ্য তার প্রতিশোধ নিয়েছে। প্রকৃতি মানুষের উপকার করে, কিন্তু তার নিজের গায়ে অন্যায় হস্তক্ষেপ ঘটালে প্রকৃতি প্রতিশোধও নেয়। নিচ্ছে এখন, সারা বিশ্বজুড়ে।

নিয়েছিল ওই নাবিকের ওপরও। পাখিটি হত্যা করার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের প্রকৃতি স্তব্ধ হয়ে গেলো। আকাশে বায়ু নেই, সমুদ্রে চলমানতা নেই। সব কিছু পাথরের মতো নীরব। মৃত। নাবিকের সঙ্গীরা সবাই একে একে মারা পড়ল। নাবিক মরলো না, মরলে বেঁচে যেতো, সে পড়ে রইলো অর্ধমৃত হয়ে, মৃত নাবিকদের জ্বলজ্বলে চোখের অভিশাপ এবং মৃতের দেশে একা বেঁচে থাকার শাস্তি বহন করতে করতে। অনাবশ্যক পাখি হত্যা কেবল ওই নাবিকের একার ব্যাপার নয়। পাখি হন্তা যেখানে-সেখানে পাওয়া যায়। কেউ মারে, কেউ মারতে চায় কিন্তু পারে না। পাখি শিকার করার আনন্দ অত্যন্ত উত্তেজক বৈকি। ধরেও আনে পাখিকে। আটকে রাখে খাঁচায়। বিক্রি করে অন্যের কাছে। একাত্তরের যুদ্ধচলা সময়ের একটি ছবি মনে পড়ে। শরণার্থীরা চলেছে, দেশত্যাগ করে। অস্থাবর সম্পত্তি যার পক্ষে যতটা বহন করা সম্ভব সঙ্গে নিয়েছে। এক ব্যক্তির হাতে একটি খাঁচা, তার ভেতরে একটি টিয়া পাখি। লোকটি শরণার্থী, চলেছে মুক্তির খোঁজে, সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে বন্দী এক প্রাণীকে। কেবল তাই নয়, দেখা যাচ্ছে পাখিটিকে সে একটি বুলি শেখাচ্ছে, বলছে- 'বল জয় বাংলা'। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ দুর্বলতামুক্ত ছিল না, তার একটি দুর্বলতা ছিল সাংস্কৃতিক; ওই ছবি সেই দুর্বলতারই দ্যোতক হয়তো বা।

কিন্তু এটি আবার মানবিক দুর্বলতাও। মানুষ মনে করে জগতের সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার জন্যই। তাই সবকিছুতেই সে নরত্ব আরোপ করে, সবকিছুকেই ব্যবহার করে নিজের প্রয়োজনে এবং মাপতে চায় নিজের ওজন দিয়ে।

পাখিকে মানুষ হত্যা করে যেমন, পাখিহত্যা দেখলে মানুষ ক্রন্দনও করে বটে। বলা যায়, উপকারী পাখি দুভাবেই উপকার করে মানুষের। নিহত হয়ে এবং হত্যাকান্ডের জন্য শোক প্রকাশের সুযোগ করে দিয়ে। বাল্মীকির কাব্য প্রতিভার স্ফুরণ তো ঘটেছিল নিষ্ঠুর ব্যাধের হাতে ক্রৌঞ্চযুগলের একটির হত্যাকান্ড এবং তাতে অপরটির শোকপ্রকাশের করুণ দৃশ্য দেখেই। সকলেই বাল্মীকি নন, কিন্তু সব মানুষের মধ্যেই সহানুভূতিশীল একজন বাল্মীকি রয়েছেন- কম আর বেশি।

কাব্যের কথা যখন উঠলোই তখন সাহিত্যে পাখির ব্যবহারটাও স্মরণ করা যাক। উপমা ও রূপক হিসাবে পশু ফুল বৃক্ষ পতঙ্গ সবকিছুই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সব সাহিত্যেই মনে হয় দেখা যাবে পাখি যতভাবে ও যত সংখ্যায় আছে তত বোধ করি অন্যকিছু নেই। তার ব্যাখ্যাটাও হয়তো এ রকমের হতে পারে যে, প্রত্যেক মানুষের ভেতরই একটি পাখি আছে। কখনো কখনো তাকে প্রাণপাখিও বলা হয়। ভেতরের ওই পাখি অনেক সময় গান গায়। কখনো হয়তো বা কান পেতে গান শোনে। সে উড়তে চায়, পাখির মতো। মুক্তি চায় মুক্ত আকাশে। অনুভব করে যে তার খাঁচার ভেতর এক অচিন পাখি বাস করে, সে আসে যায়, কিন্তু যাকে সে ঠিক চেনে না। যে রহস্যই রয়ে যায়।

৩.

পাখির উপকার ক্ষমতার মনে হয় কোনো শেষ নেই। তার কাছে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো তো অনেক। প্রথম শিক্ষাটাই হলো এই যে, উপকারী হওয়া চাই, মানুষের মতো নয়, পাখির মতো। মানুষের উপকারে ছলনা থাকে, থাকে নানা বঞ্চনা ও নিপীড়নের অভিপ্রায়। যে জন্য উপকার প্রায়শই হয়ে দাঁড়ায় অপকারের ছদ্মবেশ মাত্র। অপরপক্ষে পাখি মানুষের উপকার করে স্বাভাবিক প্রবণতায়। সেখানে কোনো প্রকার আত্মসচেতনতা নেই। যেমন নেই প্রাপ্তির আশা। উপকার করবার আদর্শ পন্থা ওইটাই।

পাখি অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের জন্য চমৎকার দৃষ্টান্ত, অনুকরণের। যেমন মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে লালন-পালন করা। বলা বাহুল্য, ওই আকাঙ্ক্ষাটা মানুষের ভেতরও রয়েছে। মানুষও চায় সে পশুর মতো আবদ্ধ থাকবে না, সে পাখির মতো উড়বে। মানুষ উড়েছেও, প্রথমে ডানা তৈরি করে উড়তে চেষ্টা করেছে, পারেনি, পরে উড়োজাহাজ উদ্ভাবন করে চরিতার্থ করেছে তার উড়বার ইচ্ছা। কিন্তু কেবল ওড়া তো নয়, আসল কথা মুক্তি। পাখি আকাশে ওড়ে মুক্তির আনন্দে। ব্যক্তির ভেতরও ওই আকাঙ্ক্ষাটা থাকে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার বিকাশ ঘটে না, ইচ্ছাটা নেতিয়ে পড়ে, আত্মসমর্পণ করে, সত্য হয়ে থাকে শুধু পরাধীনতার গ্লানি। পাখির আচরণ কিন্তু ভিন্ন রকম। সে যতক্ষণ পাখি থাকবে ততক্ষণ উড়বার ইচ্ছা ও অভ্যাস তার থাকবেই। পাখিকে অবলুপ্ত করে দেয়া যাবে, তাকে হত্যা করা হয়, তার প্রজাতি নির্মূল হয়ে যায়। কিন্তু মুক্তির জন্য তার ব্যাকুলতা স্বভাব থেকে ছিন্ন হয় না। একটি পাখি সব সময়ই পাখি, সবখানেই সে তার নিজের মতো, মানুষ সেটা নয়।

পাখির স্বাবলম্বন, পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন ও শৃঙ্খলা মানুষের জন্য শিখবার ও অনুশীলন করবার বিষয় হবার যোগ্যতা রাখে বৈকি। পাখির জীবনে বিলাস নেই, বাহুল্য নেই, নেই অপরের ওপর নির্ভরশীলতা। একই প্রজাতির ভেতর সেখানে বৈষম্য দেখা যাবে না, যেমনটা মানুষের মধ্যে দেখা যায়, অনিবার্যভাবে। নারী-পুরুষের পার্থক্য রয়েছে, যেটা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু পুরুষতান্ত্রিকতা একেবারে নেই। পুরুষ ও নারী এক সঙ্গে বাসা তৈরি করে, নারী যখন সন্তান উৎপাদনে ব্যস্ত থাকে, পুরুষ তখন বাসা পাহারা দেয়। শিশুদের যত্ন নিতে পিতামাতার সমান আগ্রহ দেখা যায়। অনাত্মসচেতনতা পাখির একটা বড় গুণ। সবচেয়ে বড় শিক্ষণীয় বিষয় যেটি সেটি হলো ব্যক্তি ও সমষ্টির সম্পর্ক। প্রত্যেকটি পাখিই আলাদা, তার নিজস্ব গৃহ আছে, রয়েছে পারিবারিক জীবন। কিন্তু সে আবার সামাজিক জীবনও যাপন করে, ঝাঁক বেঁধে থাকতে চায়, ঝাঁক বেঁধে ওড়ে। ব্যক্তিত্ব ও সামাজিকতার এই সম্মিলনকেই বুঝি বলে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিকতা। বৈষম্য নেই, স্বাতন্ত্র্য আছে, রয়েছে যৌথ জীবন যাপন; মানুষ যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়বার স্বপ্ন দেখে, সেই ব্যবস্থাটা সে বাস্তবে দেখতে পায় পাখিদের রাজ্যেই।

অথচ মানুষ পাখিকে হত্যা করে। মানুষ মানুষ মারে, পাখিও মারে, মানুষ মারে এমনভাবে যেন তারা পাখি। পাখির মধ্যে দুই জাতি আছে। একটি যাযাবর, অপরটি স্থানীয়। যাযাবরেরা এক জায়গায় থাকে না, তাদের বলা হয় বসন্তের পাখি, শীতে আসে, বসন্ত এলে চলে যায়। স্থানীয়রা এক জায়গাতেই থাকে। কিন্তু যাযাবরই হোক আর স্থানীয়ই হোক, পাখিরা ক্ষতিকর নয়। মানুষের মধ্যে দুই ধরন দেখা যায়- অত্যাচারী এবং অত্যাচারিত। এই বিভাজনটি একেবারেই ভিন্ন ব্যাপার। মানুষের ভেতর অত্যাচারপ্রবণতা আছে, সে ক্ষমতা ভালোবাসে, ভোগবাদী হয়, সে তাই অন্য মানুষের ওপর নির্যাতন চালায়। এই নির্যাতন হচ্ছে গণতন্ত্রের জন্য মস্ত বড় অন্তরায়। পাখির জগতে ব্যাপার ভিন্ন। সেখানে এক প্রজাতির পাখি অন্য প্রজাতির ওপর অত্যাচার করে বটে, কিন্তু একই প্রজাতির ভেতর ঐক্য ও সাম্য বিদ্যমান, মানুষের ভেতর যেটা নেই। পাখিদের কোনো গুদাম নেই, সব উপকারের সেখানে সমানভাবে বিতরণ ঘটে, মানুষের ক্ষেত্রে যেটা ঘটে না।

বাঘের কাছে নয়, পাখির কাছেই যাওয়া ভালো। এবং যেতে হবে উপকার করবার মনোভাব নিয়ে নয়, লোভলালসা নিয়ে তো নয়ই, যেতে হবে বন্ধু হিসেবে- তবেই উপকার লাভ হবে। মানুষকে বিশ্বের সবকিছুর মানদন্ড করতে নেই, তা করতে গেলে বিশ্বকে হারাতে হবে, এখন যেমন হচ্ছে। উন্নতির জন্য বৈচিত্র্য প্রয়োজন, যদিও বৈষম্য একেবারেই নয়।

ভালো কথা, 'আগে গেলে বাঘে খায় পিছে গেলে সোনা পায়' বলে একটা প্রবচন আছে। খাঁটি বাঙালি তত্ত্বকথা। বাঙালি সামনে এগিয়ে যেতে ভয় পায়, পেছনে থাকাটা নিরাপদ মনে করে, যে জন্য সাহস করে সামনে যে এগিয়ে যায় তাকে নেতা বলে মানে। পাখি বলে সামনে নয়, পেছনে নয়, সঙ্গে থাকো; সেটাই সর্বোত্তম পন্থা।

পাখির স্বাবলম্বন, পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন ও শৃঙ্খলা মানুষের জন্য শিখবার ও অনুশীলন করবার বিষয় হবার যোগ্যতা রাখে বৈকি। পাখির জীবনে বিলাস নেই, বাহুল্য নেই, নেই অপরের ওপর নির্ভরশীলতা। একই প্রজাতির ভেতর সেখানে বৈষম্য দেখা যাবে না, যেমনটা মানুষের মধ্যে দেখা যায়, অনিবার্যভাবে। নারী-পুরুষের পার্থক্য রয়েছে, যেটা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু পুরুষতান্ত্রিকতা একেবারে নেই। পুরুষ ও নারী এক সঙ্গে বাসা তৈরি করে, নারী যখন সন্তান উৎপাদনে ব্যস্ত থাকে, পুরুষ তখন বাসা পাহারা দেয়